রঙ্গ-ব্যঙ্গ সাহিত্য কথা

অজয়কুমার ঘোষ

১।

হাস্যবোধ মানুষের সহজাত। প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র মানুষই হাসতে পারে, অন্য কোন প্রাণী হাসতে জানে না। যদিও কথায় বলে, 'হায়েনার হাসি'। সেটা অ াসলে হাসিই নয়, হাসির মতন এক ধরনের জান্তব শব্দ, হাসির মতই হাওয়ায় কম্পন-তরঙ্গ তোলে। মানুষই হাসতে পারে, কারণ মানুষ বুদ্ধিমান জীব এবং বুদ্ধির সঙ্গেই হাস্যরসের যোগ নিবিড়। অর্থাৎ হাস্যরস আবেগ-প্রসূত নয়, বুদ্ধি-প্রসূত; হৃদয়োত্থিত নয়, মস্তিষ্ক-সঞ্জাত। ব্যঙ্গ-রস এই হাস্যরসেরই অন্তর্গত। সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে 'হাস' বা হাস্যবোধ মানুষের 'স্থায়িভাবে'র অন্যতম। 'রতির্হাসশ্চ শেকশ্চ'..... ইত্যাদি ন'টি স্থায়িভাবের কথা তাঁরা বলেছেন। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস খুব উঁচু দরের ছিল না, অন্যান্য রসের তুলনায় তার আসন ছিল নীচের দিকে। হাস্যরসের মধ্যে যে বৈচিত্র্য, রঙ্গব্যঙ্গের যে রকমফের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য আছে যেমন Wit, Humour, Satire, Fun, Pun, Irony, Sarcasm ইত্যাদি,-তাও তাঁদের নজরে পড়েনি। যদিও 'দশরূপক'-কার ধনঞ্জয় দশ-প্রকার নাট্যরূপের অন্যতম প্রহসন'কে শুদ্ধ, বিকৃত ও সংকর (তদ্বৎ প্রহসনং ত্রেধা শুদ্ধ বৈকৃত সংকরৈঃ) এবং পঞ্চদশ শতকের 'সঙ্গীত সর্ব্ব'-কার জগদ্ধর ছ'রকম হাসির কথা বলেছেন, যথাঃ স্মিত, হসিত, বিহসিত, সহসিত, প্রহসিত ও অতিহসিত, তবুও পাশ্চাত্ত্য রসবে ত্তাগণ হাস্যরসের মধ্যে উপরি-উক্ত যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নানা পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন, এঁরা তা করতে পারেনি। এক ধরনের স্থূল আমোদ সৃষ্টিই তাদের মূল লক্ষ্য ছিল। সংস্কৃত নাটকে বিদূষক চরিত্র তার শ্রেষ্ঠদৃষ্টান্ত। রাজার বয়সী এই বিদূষক মজার মজার (Funny) কথা বলে রাজার মনোরঞ্জন করে থাকে। রাজা যখন বিবাহ-বিকারে জর্জর, বিদূষক তখন লড্ডুক ভক্ষ্ণর বাসনা বা ঔদারিকতা প্রকাশ করে থাকে। এই যে অসঙ্গতি তা থেকেই হাস্যরসের সৃষ্টি হল। এ তো অতি সাধারণ এক অসঙ্গতির কথা। গভীর ভাবে দেখতে গেলে হাস্যরসের জন্মমূলেই অসঙ্গতি। 'হেসে নাও, দু'দিন বই তো নয়।' অনন্ত জীবন-প্রব াহে মানুষের জীবন-প্রবাহে মানুষের জীবন বড়ই স্বল্পস্থায়ী। এখানেই জীবনের মৌলিক অসঙ্গতি। এই অসঙ্গতি থেকে কারও রেহাই নেই।

অধ্যাপক পেরির (H.T.E Perry) ভাষায়, 'Caught in this dilemma man half-consciously realizes the anomalous nature of his position on the terrestrial glold, and he laughs partly from discomfort, partly from exuberance and altogether from perplexity at the fate that has placed him here.' অর্থাৎ এই মহাবিশ্বের বিশালতায় অসহায় মানুষ নিজের ক্ষুদ্রত্ব ও অকিঞ্চিৎকরত্ব বোধজনিত অস্বস্তিবোধ ও বিমূঢ়তা থেকেই হাসে। বলা চলে, বেঁচে থাকার মর্মমূলেই যে অস্বস্তি ও অসঙ্গতির বাসা, তাকে ঘিরেই মানুষের যা কিছু হাসি-কান্না প্রেম-ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্রোধ-ক্ষোভ-লালসা-স্নেহ-মোহ-বন্ধন। এর মধ্যেই রয়েছে নানা ধরনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সমস্যা-সংকটের অপরূপ সংঘট্ট, নানা ধরনের স্ব-বিরোধিতা ও অসঙ্গতি।

হাস্যরসিক এখানেই তার রঙ্গ-ব্যঙ্গের আলো ফেলে জীবনের বহু কৌণিক ও বহুস্তরবিশিষ্ট দিক গুলো তুলে ধরেন। এক হিসাবে হাস্যব্যঙ্গের লেখকেরা তাই জীবন-দার্শনিক। হাস্যব্যঙ্গরসের স্বরূপ ও লক্ষণ নিয়ে বহুকাল থেকেই নানা দার্শনিক, মনস্তত্ত্ববিদ, কবি-সাহিত্যিক-সমালোচকেরা আলোচনা করেছেন এবং সংজ্ঞা দান করার চেষ্টা করেছেন। কোন সংজ্ঞাই সম্পূর্ণ নয়। কারণ হাস্যব্যঙ্গরসের ক্ষেত্র বিপুল ও বিচিত্র। এই বিপুলতা ও বৈচিত্র্যের জন্যেই তার মধ্যে ন ানা সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। ফলে নানা নামে তাকে চিহ্নিত করতে হয়েছে এবং নানা বিভাগ-উপবিভাগে বিভক্ত করতে হয়েছে।

২।

সেই কতকাল আগে অ্যারিস্টটল (খ্রীপূ ৩২২(মৃত্যু)) বলেছিলেন যে হাস্যরসের মূলে রয়েছে 'Some defect or ugliness which does not imply pains.' পরবর্তীকালের দার্শনিকেরা মূলত এই উক্তিটিকে অবলম্বন করেই হাস্যব্যঙ্গের সংজ্ঞা, স্বরূপ ও লক্ষণ নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। কেউ বলেছেন, অপরের দুর্দশা দেখে ও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে আমরা হাসি (হাসব)।

এই মতটিকেই অল্পবিস্তর সমর্থন করেছেন দেকার্তে (Decartes) মেরেডিথ, বার্গস প্রমুখ দার্শনিক এবং ভলতেয়ার, জাঁ পল রিখটার, কার্লাইল থ্যাক ারে এবং আধুনিক কালের পামার, পেরি, লিকক প্রমুখ লেখক-সমালোচকেরা হাস্যব্যঙ্গরসের অন্যান্য নানা দিকও নির্দেশ করেছেন।

স্পিনোজা অপরকে আঘাত বা বিদ্রূপ করার মধ্যেই হাস্যরসের মূল অনুসন্ধান করেছেন, কিন্তু রিখটার এ মত সমর্থন করেননি। কান্ট অবশ্য বলেছেন যে, কোন প্রত্যাশার শূন্যময় পরিণতি (The sudden transformation of a strained expectation into nothing) অর্থাৎ অসঙ্গতিজনিত এক ধরনের আকস্মিক উপলব্ধিতেই হাস্যব্যঙ্গের কারণ ঘটে। এই কথাটাই আরও বিশদ করে বলেছেন শোপেন হাউহার — 'Sudden Perception of the incongruity between a concept and the real objects.' হার্বার্ট স্পেনসারও এই অসঙ্গতির ওপরেই জোর দিয়েছেন। বৃহৎ অনুভূতির প্রত্যাশা করে শূন্য বা সামান্য অনুভূতিতেপৌঁছবার মধ্যে যে আকস্মিকতা আছে তাতেই আমাদের মনে হাস্যব্যঙ্গে র জন্ম হয়। এ যেন 'পর্বতের মূষিক-প্রসব'!

হেগেল, বিদ্রূপ বা তাচ্ছিল্যের ভাব থেকে যে হাস্যরসের উদ্ভব, তা স্বীকার করেননি, তাঁর মতে, হাস্যজনক বিষয় বা চরিত্রের সঙ্গে মানুষ নিজেকে একাত্ম করে দেখে বলেই হাসে। অর্থাৎ হাস্যব্যঙ্গরস এক ধরণের আত্মসমালোচনা বা আত্মদর্শন। সেইজন্যে কার্লাইল, থ্যাকারে, পামার প্রমুখ লেখকরা বলতে

চেয়েছেন যে অপরকে খোঁচা দিয়ে আঘাত করাতে হাস্যরস নেই। কার্লাইল তাই বলেই ফেলেছেন যে সত্যকার হাস্যরস মস্তিষ্ক-প্রসূত নয়। হৃদয়োত্থত — 'True humour spring not mere from the head than from the heart; it is not contempt, its essence is love.'

অর্থাৎ মানুষের প্রতি, জীবনের প্রতি ভালোবাসা থেকেই জীবনের অসঙ্গতি দেখে আমাদের মনে হাস্যব্যঙ্গ রসের উদ্ভব ঘটে।

সেইজন্য আধুনিক কালের হাস্যরসতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক স্টিফেন লিকক্ হাস্যরসের সঙ্গে ব্যাপক সহানুভূতি ও সহৃদয়তার যোগ লক্ষ্য করেছেন (Kindly contemplation of life, and the artistic expession thereof) 'Kindly' কথাটুকু লক্ষ্যণীয়।

এ সম্পর্কে আরও নানা দার্শনিক মণীষী, মনস্তত্ত্ববিদ ও সমালোচকের নানা মত উদ্ধার করা যায়। কিন্তু আর বাড়িয়ে লাভ নেই।

৩।

উপরের আলোচনা থেকে এটুকু অন্ততঃ বোঝা গেল হাস্য-ব্যঙ্গ রসের জন্ম মূলে রয়েছে এক বিরাট অসঙ্গতি এবং যে অসঙ্গতি মানব-জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত। এই অসঙ্গতির নানা কমফের দেখতে পাই রাষ্ট্রে, সমাজে ও ব্যক্তিজীবনে। ব্যঙ্গ-রস-তা Satire, Irony, Wit, Sarcasm যা-ই হোকনা কেন, ব্যাপকভাবে হাস্যরসেরই অঙ্গীভূত। তাই, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে দেখি যখনই সমাজে কোন বিকৃতি, বিচ্যুতি ও ব্যত্যয় দেখা গেছে, তখনই শ্রেষ্ঠ লেখকেরা ব্যঙ্গের কশাঘাতে তাকে জর্জরিত করেছেন, মূল উদ্দেশ্য হল সমাজকে সুস্থ ও স্বাস্থ রাখা। ব্যঙ্গ সাহিত্য তাই। উদ্দেশ্য মূলক। সেক্সপীয়র, ভলতেয়ার, শো, অ্যাডিসন, মলিয়ের, সুইফ্ট্, বালজাক, মোপাসাঁ থেকে আরম্ভ করে বানার্ড শ পর্যন্ত বিশ্বের শ্রেষ্ঠসাহিত্যিকেরা এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের কথা আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, তবে তাঁদের রচনার সঙ্গে পরিচয়ের ফলেই অধুনিককালের বাংলা সাহিত্যে যে হাস্য-ব্যঙ্গরসের মধ্যে গুণগত ও মাত্রাগত উৎকর্ষ ঘটে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

এই কথা মনে রেখে বাংলা সাহিত্যে হাস্য-ব্যঙ্গ রসের চেহারা ও চরিত্র সম্পর্কে শুধু একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা যেতে পারে।

বিস্তৃত আলোচনার স্থান ও অবকাশ নেই, কারণ তা সম্পূর্ণ গ্রন্থের বিষয়।

৪।

বাংলা সাহিত্যে, আধুনিক দৃষ্টিতে, সত্যকার হাস্য-ব্যঙ্গ রসের সৃষ্টি হল উনিশ শতকে এসে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শেই তার উদ্ভব। এদেশে উনিশ শতকের জন্মমূলেও এক অসঙ্গতি। মধ্যযুগীয় জীবনের জঠর থেকে কলকাতা-কেন্দ্রিক নব্যযুগ সবে মাত্র ভূমিষ্ঠ হচ্ছে। এদিকে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থা, অন্যদিকে বণিকী পুঁজির আবির্ভাব এবং তার মধ্যথেকে আধুনিক বিত্তজীবী বা বুর্জোয়া শক্তির আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পঙ্গু প্রচেষ্টা; একদিকে প্রাচ্যদেশীয় টোল-মক্তব-বেকন-কার্লাইল-টম পেইন-মিল-বেন্থাম-মেকলে-সাহিত্যের পঠন-পাঠন; একদিকে রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের আচার-সংস্কার কেন্দ্রিক অনুদার সংকীর্ণতা, অন্যদিকে নব্যশিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গলদের উৎকেন্দ্রিক উচ্ছৃঙ্খলতা, একদিকে বনেদি ভূ-স্বামীদের প্রাচীন ঐতিহ্যরক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা, অন্য দিকে ইংরেজদের উচ্ছিষ্টভোজী বাঙালী বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, দালাল, চাটুকার হঠাৎ বিত্তস্ফীত 'হঠাৎ-নবাবদের উৎকট বুয়ানি, তর্জা-কবির লড়াই, বুলবুলি ও মোরগের লড়াই, বেড়ালের বিয়ে ও ঘুড়ির লড়াই, গণিকা-গমন, রক্ষিতা-পালন ও 'উৎসব-ব্যসনে-চৈব' অপর্যাপ্ত অর্থ প্রতিপত্তির নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন। কলকাতাকে কেন্দ্র করে কত শ্রেণীর মানুষেরই না আমদানি হল সেখানে — জমিদার, পুরোহিত, চোর, দালাল, ফড়ে, পন্ডিত-মূর্খ-ধনী-দরিদ্রের এক জগা-খিচুরি!

সমাজজীবনের এই বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্যের মধ্যে যে অসঙ্গতি তা থেকেই তো সত্যিকার রঙ্গ-ব্যঙ্গের উদ্ভব হয়ে থাকে। এবং হয়েও আছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের দ্বিতীয় দশকেই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (প্রমথ নাথ শর্মার) নববাবু বিলাস, দূতীবিলাস, কলিকাতা কমলালয় তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। সমসাময়িক কালে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়ও তা ধরা পড়ল। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের ব্যঙ্গমূলক রচনায় (অতি অল্প হইল, আবার অতি অল্প হইল, ব্রজবিলাস, রত্নপরীক্ষা) এবং রামনারায়ণ, দীনবন্ধু সাইকেলের প্রহসনে এবং তৎকালীন অজস্র নক্সাজাতীয় রচনায় এবং প্রহসনে তার প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল। ইতঃপূর্বে টেকচাঁদ ঠাকুর তাঁর আলালের ঘরের দুলাল, মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায় এবং কালীপ্রসন্ন তাঁর হুতোম প্যাঁচার নকসাতে তৎকালীন সমাজের অসঙ্গতিকে চমৎকার তুলে ধরেছেন।

৫।

বস্তুত সমাজ-দেহ এবং সেই সঙ্গে মানব-চরিত্রে যখনই কোন আলোড়ন বিক্ষোভ-বিক্ষেপ ও অসঙ্গতি দেখা দেয় তখনই তা ধরা পড়ে ব্যঙ্গরসিকের কলমে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটানা নাটগীত-মঙ্গল-পাঁচালি-পালাকীর্তন ও পদাবলী রচনার ধারায় হাস্য-ব্যঙ্গ রস সৃষ্টির অবকাশ ছিল না, কারণ জীবন ছিল কৃষি-নির্ভর ও ভূমিলগ্ন এবং সমাজ ছিল অল্পবিস্তর স্থিতিশীল। তাই চর্যাপদ থেকে শাক্ত পদাবলী (আনুমানিক ১০ম থেকে ১৮শত শতক) পর্যন্ত দূর-বিসর্পিত সাহিত্য প্রবাহে মাঝেমধ্যে দু-এক স্থলে হাসি-ঠাট্টা কৌতুক মস্করার একটু আধটু প্রকাশ দেখা গেলেও তাকে ঠিক উচ্চ স্তরের হাস্য-ব্যঙ্গ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ও মঙ্গল কাব্যের দু'এক স্থলে দেবতাদের নিয়ে কৌতুক করার সূত্রে তা ধরা পড়েছে। একমাত্র ভারতচন্দ্রের সাহিত্যেই যা কিছু বুদ্ধি-বৈদগ্ধ্যপূর্ণ হাস্য-ব্যঙ্গের নিদর্শন পাওয়া গেছে। কারণ ভারতচন্দ্রের যুগ থেকেই মধ্যযুগের পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। বর্গী আক্রমণ ইউরোপীয় বণিকদের আগমন পলাশীর যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনার অভিঘাতে সমাজ দেহে কম্পন অনুভূত হচ্ছিল। ভারতচন্দ্রের সাহিত্যে স্পষ্টত না হলেও কদাঞ্চিৎ তা ধরা পড়েছে। তাই, শিবের বিবাহ যত্রা, দক্ষযজ্ঞ নাশ, ভূতপ্রেতের তাণ্ডব, নারদের বর্ণনা প্রভৃতি অংশে আমরা এক ধরনের হাস্য ব্যঙ্গরসসৃষ্টির প্রবণতা লক্ষ্য করি। মধ্যযুগীয় ভক্তি-বিশ্বাস অনেক পরিমাণে তিরোহিত, দেব-নির্ভরতার ভারকেন্দ্র বিচলিত; পুরোনো মূল্যবোধ বিদায় নিচ্ছে, অথচ নূতন কোন মূল্যবোধও গড়ে ওঠেনি। এহেন অস্থিতিশীল সামাজিক অবস্থায় যে অসঙ্গতি দেখা দেয়, তা থেকে স্বভাবতঃই হাস্য ব্যঙ্গরসের উদ্ভব হতে পারে। তবে ভারত চন্দ্রের হাস্যব্যঙ্গ রসের বর্ণনা স্থূলতার স্পর্শমুক্ত নয়। অনেক ক্ষেত্রে অশ্লীল।

৬।

ভারতচন্দ্রের পর উনিশ শতকে এসেই কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় ব্যঙ্গরসের সাক্ষাৎ পেলাম। ঈশ্বর গুপ্তের যুগ নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল, ঈশ্বর-গুপ্ত যুগ-সন্ধির কবি। যুগ-সন্ধির নানা সঙ্গতি অসঙ্গতিই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। ইয়ং বেঙ্গলের নেতিবাচক উচ্ছৃঙ্খলতাই হোক, কিংবা ইতিবাচক নারী শিক্ষাই হোক, ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গের তির সকলকেই বিদ্ধ করে। আসলে যুগ-সন্ধির কবির নিজের মধ্যেই একটা স্ববিরোধিতা ছিল, সেটা যুগেরই সমস্যা-সংকট ও স্ববিরোধিতা। তাই, 'আগে ছুঁড়িগুলো ছিল ভালো। ব্রতধর্ম করত সবে একা বেথুন এসে শেষ করেছে, আর কি তেমন দেখতে পাবে?' — বলে যেমন তিনি স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধিতা করেছেন, তেমনি 'সম্বাদ প্রভাকরের' সম্পাদকীয়তে অবলা কুলের দুরবস্থায় অশ্রুবিসর্জনও না করে পারেননি। একদিকে ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে/শ্রমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া'-র মতো কবিতা স্বদেশপ্রেমাত্মক লিখেছেন। অন্যদিকে 'ভারতের প্রিয়পুত্র হিন্দুসমুদয়/গাও সবে মুক্ত কণ্ঠে ব্রিটিশের জয়' ধরনের কবিতাও লিখেছেন। একই ব্যক্তি, অথচ তার দুইটি মুখ।

যুগের এই স্ববিরোধিতাই হাস্য-ব্যঙ্গের জন্ম দিয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে নিজের কোন সুস্থিত ও সুদৃঢ় ভিত্তিভূমিতে উপনীত হ'তে পারেন, বরং নিজেই তার শিকার হয়ে পড়েছেন। নইলে, তাঁর হাতেই আমরা হয়তো সত্যিকার হাস্য ব্যঙ্গের ইতিবাচক কবিতার প্রথম ফসল পেতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় মানসিক দিক থেকে তাঁর টান ছিল রক্ষণশীল প্রাচীনের দিকেই। তাঁর কবি প্রতিভাও ছিল না খুব উঁচু দরের; প্রাচীন কবিওয়ালাদের সঙ্গেই ছিল তাঁর মনের সাধর্ম্য।

রামমোহনের যুগ থেকে বিদ্যাসাগরের যুগ পর্যন্ত সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সংস্কারমূলক আন্দোলন চলে আসছিল, যেমন সতীদাহ প্রথা নিবারণ, ব্রহ্ম ধর্মের আন্দোলন, বিধবা বিবাহ প্রচলন ও বহু বিবাহ নিরোধ, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তার, স্ত্রী শিক্ষা প্রচলন, যার ফলে সমাজে প্রাচীন ও নবীন ভাবধারার সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল, সেই সংঘর্ষে উৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশির মধ্যেই নিহিত ছিল হাস্য-ব্যঙ্গের বীজ। বিধবা বিবাহের ও বহু বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিরোধ অবধারিত হয়ে উঠল। বিদ্যাসাগরকে ছদ্মনামে লিখতে হল 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল', 'ব্রজ বিলাস' নামক ব্যঙ্গমূলক পুস্তিকা। রামনারায়ণ তর্করত্ন লিখলেন কুলীন কুলসর্বস্ব, মধুসূদন লিখলেন 'বুড়ো শালিকের ঘারে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা', দীনবন্ধু লিখলেন 'সধব ার একাদশী', 'নবীন তপস্বিনী' ও বিয়ে পাগলা বুড়ো'। কলকাতা ও পর্শ্ববর্তী অঞ্চলের জীবন নিয়ে লেখা হল 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' ও 'আলালের ঘরে দুলাল' চরিত্রগুলো সহজ স্বাভাবিক মানুষ নয়, যেন কার্টুনিস্টের আঁকা ব্যঙ্গ-চিত্র।

৭।

আসলে সমাজ-জীবনে যখনই আচরণে ও উচ্চারণে পার্থক্য বা অসঙ্গতি দেখা দেয়, তখনই তা ব্যঙ্গরসের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে। অতিশয্যোও অসঙ্গতির পর্য ায়েই পড়ে। তাই, দন্তহীন পলিতকেশ বৃদ্ধের বিবাহের জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠা, ঘরে রূপে গুণে সতীলক্ষ্মী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পুষের উৎকট গণিকাসক্তি, মদ্যপ ানের বাড়াবাড়ি, অত্যন্তিক অর্থ লালসা এবং তজ্জনিত নানা পাপকর্ম ইত্যাদিও তৎকালীন সাহিত্যে স্বভাবতই রচনার বিষয়ীভূত হয়েছে।

৮।

নাট্যকার গিরিশ ঘোষ প্রধানত পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক রচনার জন্য বিখ্যাত, কিন্তু যুগের প্রয়োজনে তাঁকেও কয়েকটি প্রহসনজাতীয় (তাঁর ভাষায় 'পঞ্চর') রচনা লিখতে হয়েছিল, যেমন 'বেল্লিক বাজার', 'সপ্তমীতে বিসর্জন'। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় এগুলি শ্লেষাত্মক রচনা এবং ইংরেজিতে য াকে Extravaganza বলে এগুলি সেই শ্রেণীর। নাট্যকারদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও কয়েকটি প্রহসন লিখেছেন। 'অলীকবাবু', 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ', 'হঠাৎ নবাব' প্রভৃতি। এদের প্রেরণার মূলে ছিল ফরাসি নাট্যকার মলিয়েরের প্রভাব।

এগুলি যতটা না ব্যঙ্গধর্মী। তার চেয়ে বেশি কৌতুকধর্মী। ব্যঙ্গের বিদ্যুৎগর্ভ তীব্র জ্বালা এদের মধ্যে নেই। বরং অমৃতলাল বসুর মধ্যে এই জ্বালা তীব্রতর হয়েছে, কিন্তু ব্যক্তি, বিদ্বেষ, বর্ণ (Caste) গত এবং সম্প্রদায়গত আক্রমণ মাঝে মাঝে এমন উৎকট রকমে আত্মপ্রকাশ করেছে যে, সাহিত্যে উদার অঙ্গনে তারা প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারেনি। তাঁর 'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে', 'হীরকচূর্ণ', 'চোরের উপর বাটপাড়ি' এবং বিশেষ করে 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসনটির কথা ও প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এতে হাস্য-ব্যঙ্গরস সৃষ্টির চেষ্টা পন্ডশ্রম হয়েছে, চরিত্রগুলিও বাস্তব এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিও প্রশংসনীয় নয়।

৯।

ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে হাস্য ব্যঙ্গ রসের মধ্যে যে সুচি ও সংযমের অভাব ছিল তা দূর হল বঙ্কিমের হাতে এসে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'নির্মল, শুভ্র সংযম হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে বঙ্গ সাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্বে বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসকে অন্য রসের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নি ম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত।..... বঙ্কিম সর্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেন; তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্য জ্যোতির সংস্পর্শে কোন বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য ও রমনীয়তার বৃদ্ধি হয়; তাহার সর্বাংশে প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে।' (দ্রঃ বঙ্কিমচন্দ্র / আধুনিক সাহিত্য)

বঙ্কিমচন্দ্রে 'লোকরহস্য' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এছাড়া তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধ সমূহের অনেক স্থলেই হাস্যরসের উদ্ভাসিত কিরণজ্যো তি আমাদের উপরিপাওনা বলে মনে হয়। তবে লোকরহস্যের দুএকটি লেখা ছাড়া কোন রচনাতেই ব্যঙ্গের তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা নেই।

১০।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ব্যঙ্গমূলক প্রহসন (সমাজ বিভ্রাট ও কল্কিঅবতার, বিরহ, ত্র্যহস্পর্শ, প্রায়শ্চিত্ত) লিখলেও হাসির গানের ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সমধিক। তাঁর হ াসির গান —

'আমরা বিলেতী ধরনের হাসি
আমরা ফরাসী ধরনের কাশি
আমরা পা ফাঁক করে সিগ্রেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি।'

এবং নন্দলাল প্রমুখ কবিতা আমরা ভুলতে পারি না। তবে রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে লেখা 'আনন্দ বিদায়' প্যারডির জন্য তাঁর নামে কিছুটা কলঙ্ক। এই নাটকের অভিনয় চলাকালে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কালো দিন বলে চিহ্নিত হয়ে আছে।

ইতোপূর্বে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পঞ্চানন্দ), যোগেন্দ্রনাথ বসু (মডেল ভগিনী রচয়িতা) জগদ্বন্ধুভদ্র হাস্যব্যঙ্গমূলক রচনার জন্য অল্প বিস্তর খ্যাতি-নিন্দার অংশীদার হয়েছেন। ইন্দ্রনাথের 'কল্পত' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সম্পূর্ণ ব্যঙ্গ-উপন্যাস এবং বঙ্কিমচন্দ্র এ উপন্যাসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও এটিকে চির দিক থেকে বা সাহিত্যের দিক থেকে উচ্চ আসন দেওয়া যায় না। এতে তৎকালীন প্রগতিশীল শক্তি ব্রাহ্ম সমাজকে এমন চিহীন ভাবে আক্রমণ করা হয়েছে যে তাতে লেখকের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও অনুদার সংকীর্ণতাই ফুটে উঠেছে যা রস সাহিত্যের পরিপন্থী। বরং তাঁর 'ভারত উদ্ধার' কাব্য তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। একদল তথাকথিত বিদেশি (!) যুবকের দেশোদ্ধারের জন্য যাবতীয় উদ্ভট উপায় ও কৌশল অবলম্বন চমৎকার কৌতুকহাস্য-ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছে। আমাদের তৎকালীন নব্যযুবাদের তথাকথিত দেশোদ্ধার ব্রত ও বিপ্লব প্রচেষ্টার এ এক চমৎকার ব্যঙ্গ-চিত্র। জগদ্বন্ধু-ভদ্র মাইকেলের অমর মহ াকাব্য 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্যারডি রচনা কল্পে লিখলেন 'ছুচ্ছুন্দরী বধ কাব্য'। আক্রমণের লক্ষ্য ব্যক্তি মধুসূদন, বৃহত্তর সমাজ নয়; তাই উদ্দেশ্য নিতান্তই সংকীর্ণ, তবে তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দের হাতটি প্রশংসার যোগ্য।

যোগেন্দ্র চন্দ্র বসুর 'মডেল ভগিনী' ব্যঙ্গমূলক উপন্যাস হলেও ব্রাহ্ম সমাজ, শিক্ষিত সমাজ ও নারী সমাজের প্রতি অহেতুক আক্রমণের পণ্ডশ্রমে অপব্যয়িত। উপন্যাস হিসাবেও অসার্থক, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি শুধু রক্ষণশীল নয়, প্রতিক্রিয়াশীল।

১১।
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সে যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক, শুধু রঙ্গ-ব্যঙ্গর লেখক বলেই তাঁকে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না। বস্তুত সমাজের যাবতীয় অসঙ্গতিও তাঁর সংস্কারমুক্তি, বিজ্ঞানবুদ্ধি চালিত উদার দৃষ্টির আলোকে ধরা পড়েছে। তাঁর আজগুবি ভূতের গল্পগুলিও গভীর তাৎপর্যে পরিপূর্ণ, ভূতের গল্পের রূপকে তিনি মানব সমাজ ও মানব চরিত্রের অসঙ্গতিগুলির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর কঙ্কাবতী ব্যাঙ সাহেব, ডম চরিতের ডম ধর, 'মুক্তামালা'-র গুদেব চরিত্র আমরা ভুলতে পারিনা। হাস্যব্যঙ্গ রসের মধ্যেও যে কণ রস অন্তঃশীলা হয়ে থাকতে পারে, ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতার আড়ালেও যে পরদুঃখকাতর হৃদয়ের অপার মানবিকতা-বোধ থাকতে পারে, ত্রৈলোক্যনাথের রচনা তারই নিদর্শন। উপরি উক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও তাঁর ভূত ও মানুষ, ফোক্‌লা দিগম্বর, ময়না কোথায়, মজার গল্প, পাপের পরিণাম উল্লেখযোগ্য বই। তাঁর হাস্যব্যঙ্গরসের অনেক গল্পের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ গল্প হল 'লুল্লু' ও 'বিদ্যাধরীর অচি'। মূলত ত্রৈলোক্যনাথই বাংলা সাহিত্যে সত্যকার ব্যঙ্গ রসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার।

১২।
রবীন্দ্রনাথ মূলত ব্যঙ্গ লেখক নন। তবে জীবনের এক পর্বে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতৃবৃন্দকে (শসধর তর্ক চূড়ামণি, চন্দ্রনাথ বসু) আক্রমণের লক্ষ্যে তাঁকে হিংটিংছট (সোনার তরী), উন্নতি লক্ষণ (কল্পনা) প্রভৃতি দু একটি কবিতা লিখতে হয়েছিল। এগুলিতে ব্যঙ্গের তীব্রতা যেমন ছিল, তেমনি ঈষৎ অসহিষ্ণুতাও প্রকাশ পেয়েছিল, যা রবীন্দ্র-কবি-মানসের পরিপন্থী। তবে হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর স্থান অতি উচ্চ অবস্থিত। উচ্চচি, সংযম ও অপরিসীম পরিমিতিবোধ তাঁর হাস্যরসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। তাঁর 'হাস্যকৌতুক' ব্যঙ্গ কৌতুক নামক বই দুটোর কথা বাদ দিলেও বলা চলে যে তাঁর গদ্য-পদ্য-উপন্যাস — যাবতীয় রচনার মধ্যেই এক ধরনের স্মিত-রস মৃদু জ্যোৎস্না কিরণের মতো রচনার অঙ্গে অঙ্গে লগ্ন থেকে অসাধারণ দিব্য বিভা ও লাবণ্যের সৃষ্টি ক'রে থাকে। এটি এক অনন্য দুর্লভ গুণ ও বৈশিষ্ট্য। স্থানাভাবে তাঁর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া গেলনা।

১৩।
প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) মূলত বুদ্ধিবাদী লেখক। তাঁর হাস্য-ব্যঙ্গরসের মূল অবলম্বন wit বা বাগ্ বৈদগ্ধ্য। তাঁর ঘোষালের ত্রিকথা ও নীললোহিত পর্যায়ে গল্পগুলি বুদ্ধির হীরক দীপ্তিতে উজ্জ্বল। তাঁর প্রবন্ধেও এই বাক্-চাতুর্য, বুদ্ধির বপ্রক্রীড়া এবং wit ও epiqram এর যথেচ্ছ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক, ''ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ থেকে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটি করতে গেলে মুখে শুধু কালিই পড়ে।' এ ধরনের wit-সৃষ্টির অজস্র দৃষ্টান্ত তাঁর ছোটগল্পেও ছড়িয়ে আছে।
বস্তুত রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর হাতে হাস্য ব্যঙ্গ রস এমন একটা উচ্চ স্তরে এবং উচ্চ চিতে উন্নীত হ'ল যে সাধারণ মানের লেখকদের সে স্তরে পৌঁছন সম্ভব নয়। পরবর্তীকালে পরশুরাম (রাজশেখর বসু) এবং সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখায় তার কিছুটা অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। কারণ দু'জনেই শক্তিমান লেখক।
wit-এর বৈশিষ্ট্য এর সংক্ষিপ্ততায়। সেক্সপীয়রের প্রবাদপ্রতিম সুবিখ্যাত উক্তি — brevity is the soul of wit. (Hamlet/Actll.scenll)। রিখটার সেই উক্তিটিকেই আরও একটু সম্প্রসারিত করে বলেছেন 'Brevity alone is the body and soul of wit.' অর্থাৎ সংক্ষিপ্ততা শুধু উইটের আত্মাই নয়, শরীরও বটে। তার মানে বাক্য গঠন বা বাক্যের অবয়বেও এই সংক্ষিপ্ততা থাকা চাই। এটি প্রমথ চৌধুরীর লেখায় আশ্চর্যরকমভাবে উপস্থিত। বাক্যের অতি সংহত গঠনশৈলী নির্মাণে একটি বাড়তি কথাও বলেন না।

১৪।
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৬-১৯৪৯) এক কালে হাস্যকৌতুকরস সৃষ্টির জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর 'কাশীর কিঞ্চিৎ' 'আই হ্যাজ' 'কোষ্ঠীর ফলাফল', 'ভাদুড়ী মশাই', প্রভৃতি উপন্যাস ও আমরা কি ও কে, কবুলতি 'পাথেয় দুঃখের' দেওয়ানী, মা ফলেষু, 'নমস্কারী' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ সেযুগে জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু জীবনের গভীর মর্মমূলে যে অসঙ্গতি আছে তাকে পরিহার করে জীবনের উপভোগ কৌতুকহাস্যের যে ফেনোর্মি চঞ্চলতা, তাকেই তিনি মূলত তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাই, ব্যঙ্গের জ্বালা ও ক্ষোভ, তিক্ততা ও তীব্রতা তাঁর লেখায় নেই।
বরং বনফুলের 'গল্পাণু' জাতীয় অনেক কটি লেখাতেই ব্যঙ্গের ঝাঁঝটি বেশ লক্ষ্য করা যায়, সেই সঙ্গে মানুষের প্রতি, জীবনের প্রতি তার অপার মমতা। এমন দু'একটি গল্প হল বিধাতা, গহিন রাতে, ক্যানভাসার, পরদিন বোঝা গেল, অণুবীক্ষণ, খেঁকি, বল হরি হরিবোল, নমুনা, দুই শিষ্য, সত্য ঘটনা ইত্যাদি।
পরশুরাম (রাজশেখর বসু) গল্পেও হাস্যরস খুব উচ্চস্তরের। ব্যঙ্গের তীব্রতাও কয়েকটি গল্পে বেশ লক্ষ্য করা যায়। যেমন বিরিঞ্চিবাবা, কচিসংসদ, উল্টে পুরাণ, রামরাজ্য, তিন বিধাতা, রটন্তীকুমার, দ্বান্দিক কবিতা, গন্ধমাদন বৈঠক, অগস্ত্যদ্বার, ভরতের ঝুমঝুমি, ঝালখিল্যগণ উৎপত্তি প্রভৃতি।
তবে সে জ্বালাকে হাস্য রসের জ্যোৎস্নালোকে স্নিগ্ধ করে তুলতে তাঁর দক্ষতাও লক্ষ্য করবার মতো।
সৈয়দ মুজতবা আলীর গল্পগুলিতে তাঁর অনন্য দুর্লভ স্টাইলের গুণে, — কি ভাষাভঙ্গিতে, কি উপস্থাপনার গুণে, হাস্য-কৌতুকরঙ্গ-ব্যঙ্গসব মিলেমিশে এক াকার হয়ে থাকে। সব মিলিয়ে তা অপূর্ব স্বাদবিশিষ্ট হয়ে ওঠে — একই সঙ্গে টক-ঝাল-তিক্ত-মধুর-কষায়। তাঁর চাচাকাহিনী, পঞ্চতন্ত্র ও ময়ূরকণ্ঠীর অনেক লেখা সম্পর্কেই একথা বলা চলে।

১৫।
আজ আমাদের জীবনে ও সমাজে হাস্য-ব্যঙ্গমূলক লেখার বড়ো প্রয়োজন। কারণ আমাদের সমাজে নষ্টামি, দুষ্টামি, ভণ্ডামি, ষন্ডামি বড়ই বেড়ে গেছে। আচরণে উচ্চারণে ঘটে গেছে দুস্তর ফারাক। যে লোক মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সপক্ষে গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা দেন, তিনিই তার ছেলে-মেয়েকে ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করে দেন; যিনি মুখে ঘুষ নেওয়ার তীব্র নিন্দা করেন, তিনিই দেখি ঘুষ নিতে দ্বিধা করেন না, ধর্মনিষ্ঠ যে হিন্দু ভদ্রলোক মুসলমানের নাম শুনতে পারেন না, সাম্প্রদায়িকতার পঙ্কতিলকে যাঁর সর্বদেহমন পঙ্কিল, যবনী কন্যার দেহসম্ভোগে তাঁর 'ভক্তপ্রমাদ' (মাইকেলের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ দ্রঃ) হতে আপত্তি নেই। যে অধ্যাপক প্রাইভেট টিউশনির বিদ্ধে গলাবাজি করেন, তিনিই আবার দিনরাত প্রাইভেট পড়ান, এসবতো প্রতিনিয়ত আমাদের চোখে দেখা ঘটনা। চুরি-জোচ্চুরি-ঘুষ জমানা আজ পুরোদমে চলছে। মনুষ্যত্ব আজ পেছনের বেঞ্চিতে চলে গেছে, সামনের সারিতে এসে বসেছে ভদ্রবেশী, ছদ্মবেশী অমানুষের একটা বড়ো অংশ।
এই তো ব্যঙ্গরচনার উপযুক্ত সময়। ব্যঙ্গের চাবুক হাতে নিয়ে সাহিত্যে আজ আগাপাস্তলা চাবকানো দরকার। যখনই সমাজ-দেহে দেখা দেয় অসুস্থ বিকার ও বিপর্যয়, মানবচরিত্রে ধরে মূল্যবোধের ভাঙন, দেখা দেয় মনুষ্যত্বের অপচয়, তখন দেশে দেশে শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ রচনার উদ্ভব ঘটেছে। ফরাসি দেশে ভলতেয়ার (কাঁদিদ), বালজাক (Droll Stories) , ইংলন্ডে বার্নার্ড শ (Mrs. Warren's Profession) সেই সংকট মূহুর্তে তাঁদের যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে দ্বিধা করেননি।

বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর (ব্যঙ্গমূলক পুস্তিকা), বঙ্কিমচন্দ্র (লোকরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর), ত্রৈলোক্যনাথ (কঙ্কাবতী, ডম চরিত, মুক্তামালা), মাইকেল (একেই কি বলে সভ্যতা বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ), দীনবন্ধু (সধবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভারত উদ্ধার কাব্য) এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রমথনাথ প্রমুখ অনেকেই হাস্য-ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা লিখে তাঁদের সমকালীন যুগের দাবি যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। রবীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম নন।

পরবর্তীকালে কেদারনাথ, রাজশেখর বসু (পরশুরাম), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, পরিমল গোস্বামী, সজনীকান্ত দাস, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, মুজতবা আলী প্রমুখ অনেকেই রঙ্গব্যঙ্গের তীক্ষ্ণশর নিক্ষেপ করতে দ্বিধা করেননি। বিশেষ করে নাম করতে হয় সৈয়দ মুজতবা আলীর।

সাম্প্রতিক কালের বাংলা সাহিত্যে সত্যকার হাস্য-ব্যঙ্গ রসের বড়ই অভাব। অথচ এই যুগেই রঙ্গ-ব্যঙ্গ রচনার প্রয়োজন সর্বাধিক। সময়টাও তার অনুকূল। কিন্তু আশানুরূপ রঙ্গ-ব্যঙ্গ সাহিত্যের সাক্ষাৎ মিলছে না। বৃহৎ বাণিজ্যিক পত্রে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও তারাপদ রায়ের মতো দু'একজন শক্তিমান লেখকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও তাঁদের রচনা পুরোপুরি ভাবে ব্যঙ্গ-সাহিত্য হয়ে ওঠেনি। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের কোন কোন লেখায় জীবন-দার্শনিক অনুভাবনা অনুপ্রবেশ করলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রঙ্গ-কৌতুকে অবসিত হয়েছে। এক ধরনের প্রসন্নতা এঁদের রচনায় হৃদ্যতা ও স্বাদুতা এনেছে ঠিকই, কিন্তু জীবনবোধ ও সমাজবোধের গভীরতা থেকে যে দুঃখ-প্রেম-জ্বালা-ক্ষোভ অনিবার্য ভাবে উত্থিত হয়, যা দেখা গেছে ত্রৈলোক্যনাথে, তেমনটি এঁদের লেখায় পাওয়া যায়নি।

১৬।

ইদানিং বাংলা সাহিত্যে অজস্র লিটল ম্যাগাজিনে প্রতি সংখ্যাতেই বেশ কিছু গল্পকবিতা চোখে পড়ে, কিন্তু ব্যঙ্গ-গল্প বা কবিতা খুব একটা চোখে পড়ে না। অবশ্য বেশ কিছু ছড়ায় এই ব্যঙ্গের ভাবটি ধরা পড়তে দেখেছি। ছোটগল্পেও এটি প্রয়োজন মতো আনা চাই।

ছোটকাগজের ইদানীংকালের লেখকদের মধ্যে অসীম ত্রিবেদী, প্রয়াত শৈলেন চৌধুরী, আলাউদ্দিন, আল আজাদ, চিত্ত ঘোষাল, সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সনৎ বসু, শৈলেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ কয়েকজনের কিছু কিছু গল্পে ব্যঞ্জনধর্মী ব্যঙ্গমূলকতা লক্ষ্য করেছি। আরও হয়তো দু'একজনের লেখায় সন্ধান করলে পাওয়া যাবে। কিন্তু আজকের যুগকে তার নষ্টামি-দুষ্টামি-ভন্ডামি থেকে এবং বিশেষ করে মনুষ্যত্বের অবমূল্যায়ণ থেকে যদি রক্ষা করতে হয়, তবে কবি সাহিত্যিকদের হাতে তুলে নিতে হবে ব্যঙ্গের চাবুক।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সনেট পঞ্চাশৎ'-এর 'Bernard Shaw' নামক বিখ্যাত সনেটের একস্থলে বলেছেন,

'এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক।'

এ যুগের সাহিত্যিকদের এই কথাটা মনে করিয়ে দিয়েই এ আলোচনা শেষ করছি।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com